গোলাপী শহরে আড়াইদিন

সাগর বিশ্বাস

মানুষের জীবন যেন নদীর মতো। তার চলা আছে, তরঙ্গ আছে, জোয়ার - ভাঁটা, পাড় - ভাঙা, পাড় - গড়া, মজে যাওয়া মরে যাওয়া, সব আছে। তীরে দাঁড়িয়ে এসব দেখা যায়। কিন্তু দেখা যায়না তার গভীরতা - সে গভীরে সঞ্চিত বা আশ্রিত প্রানসম্পদ, মনিমুক্তো কিংবা বর্জ্যসমূহ। আমাদের ব্যক্তি জীবন গুলিও সেইরকম। বাইরে থেকে কতটুকু তার দেখা যায়? এক একটা মানুষের জীবনে যে অন্তঃপ্রবাহ, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, দার্শনিকতা, তার কতটুকু প্রকাশ পায়? বেশিটাই তো থেকে যায় অদৃশ্য, অকথিত। একান্ত আপনজনেরাও সবটুকু দেখতে পায়না। ব্যক্তি নিজেও কি পায় ? এই যে মাঝে মাঝে চেনা চৌহদ্দি পেরিয়ে দূরের হাতছানিতে সাড়া দেওয়া, সে পথে কত মানুষের আসা - যাওয়া, কত ঘটনার সাক্ষী হওয়া, কত উপলব্ধির উন্মেষ, তার কতটুকু সঞ্চয়ে থাকে, কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারি? দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, পাহাড় থেকে সমুদ্র সৈকত, কত জায়গায় কতবার, গেলাম এলাম, তার কটা কথা লেখার অবকাশ পেলাম, রাজধানী দিল্লী কতবার দেখলাম - তার অতীত ও বর্তমান বৈভব মুগ্ধ করে, শিহরন জাগায়, আগ্রার আকর্ষন প্রতিরোধ করা যায় না, যতবার দেখি ততবারই তাকে 'অপরূপা' (ঋন ঃ নারায়ণ সান্যাল) লাগে, তবুও সে মুগ্ধতার কথা শব্দের মালায় সাজাতে পারলাম কই!

এইতো আবার চলেছি দিল্লী। না, এবার ঠিক পরিভ্রমন নয়, পারিবারিক লৌকিকতার দায়, মানুষের জীবন যোগ - বিয়োগের সমাহার - চলার পথে কত মানুষ কাছে আসে, কত দূরে চলেযায়! শংকর লিখেছেন সে যোগ - বিয়োগ - গুন - ভাগের কথা। এই অংক আর রাশিফল জীবনেরই সম্পদ - তার ব্যাঙ্ক - ব্যালেন্স। এবারের দিল্লী যাত্রা এক শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য! রক্ত - সম্পর্কের বাইরে পাওয়া আমার ভগ্নী তথা বন্ধুপত্নীর ছেলে সোমুর বিয়ে। বছর কয়েক আগে ওদের মেয়ের বিয়েতে যেতে পারিনি। সেই অভিমানে 'এবার যদি না আসো তবে...'। এরকম 'তবের অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের সামনে কে আর দাঁড়াতে চায়? তাছাড়া আমার নিজের আগ্রহ কি কম? সেবার না যেতে পারার দুঃখটা তো এখনও বয়ে চলেছি এবার সপরিবার।

পূর্বা এক্সপ্রেস সকাল ন'টা নাগাদ নতুন দিল্লী পৌঁছে' স্টেশানে নেমেই দেখি বিভাস এসেছে, সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভার অজয়। বিভাস হাওড়ার ছেলে, ভারী সুন্দর স্বভাব। অনেক বছর ধরে ও আর ওর দিদি বন্দনা মলিদের কাছে আছে। মলির সংসারে ওরা একেবারেই আপনজন। গাড়িতে আসতে আসতে নতুন দিল্লীকে যেন আরও নতুন মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাইনতে পৌঁছে গেলাম। চানক্যপুরীর এই দিকটা রীতিমতো সুন্দর ছিমছাম ও বেশ নির্জন। পৌঁছতেই মলি, অনুপ ছুটে এল। মলি তার বৌদিকে হাত ধরে নামাল, প্রনাম করল ঢিপ ঢিপ করে। মাশার গাল টিপে আদর করল। আমার মৃদুভাষী বন্ধু, ভারত সরকারের সুযোগ্য আই.এ.এস. অফিসার অনুপকুমার করমর্দন করতে করতে বলল, এই যে লেখক মশাই পথে কোনও তকলিব হয়নি তো? একে একে ছেলে মেয়েরাও এসে গেল। সবাই মিলে হৈ হৈ মিছিল করে দোতলায় সুসজ্জিত নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে থিতু হলাম।

একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল আমাদের। পাত্রী যেহেতু পাঞ্জাবি পরিবারের মেয়ে, সুতরাং বিয়ে বাড়িতে পাঞ্জাবি রীতিনীতি ও লোকাচার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলাম। সেদিন আমরাও সেই লোকাচারের সামিল। সে সব চিত্তাকর্ষক হলেও এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। আমার শান্তি হল নববধূকে দেখে। আগের দিনই তাকে দেখেছি 'শাগুন' অনুষ্ঠানে। এককথায় সুন্দরী মেয়ে। নইলে মলির পাশে পুত্রবধু হিসেবে মানাত না। পরদিন তালকাটারর রিসেপশান - উৎসবে শাশুড়ি আর বউকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে নিজের হাতে ছবি তুলে সে ভারসাম্যের দলিল নির্মান করে রেখেছি। এখানে আরও একটা ব্যাপার বেশ চমকপ্রদ লাগল। আমরা পশ্চিমবাঙলায় হিজড়েদের দৌরাত্ম্য দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু খোদ রাজধ

ানী দিল্লীতেও সে দৌরাত্ম্য দেখতে হবে ভাবিনি। বিয়ে বাড়িতে (চানক্যপুরী) এসে ইতিমধ্যেই একদিন কয়েকহাজার টাকা তারা নিয়ে গেছে। আবার এসেছে রিসেপশানের দিন। এখানকার হিজড়েরা বেশ সফিসটিকেটেড, আমাদের ওখানকার মতো হেঁজিপেজি নয়। দলের নেতৃত্বে যিনি - তিনি তো রীীতিমতো সুন্দর (ঈ)। শেষমেষ অবশ্য এদের হাত থেকে রেহাই পেতে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এর কদিন পরেই জয়পুরে বসে হিন্দুস্তান টাইমস কাগজে সন্দীপন শর্মার একটি প্রতিবেদনে দেখি সেখানে আসল এবং নকল হিজড়েদের নিয়ে দান সমস্যা। আসলদের অভিযোগ, কিছু বেকার যুবক আর বিন - শহর থেকে আসা হিজড়েরা মাযুতকে বিশেষত যাত্রী ও ভ্রমনার্থীদের হেনস্থা করে টাকা আদায় করছে। আসলে অনেক সময় তাদের পৃষ্ঠপোষক দের কাছে গিয়ে শুনছে, তাদের প্রাপ্য একদল হিজড়ে এসে আগেই নিয়ে গেছে। এসব ঘটনায় তাদের মানসশ্রম খর্ব হচ্ছে বলে তারা বিক্ষুব্ধ।

আনন্দের দিন বড় তাড়াতাড়ি চলে যায় । উৎসব শেষ। একে একে আত্মীয়, বন্ধুরা যে যার আপন ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। কেউ মধ্যপ্রদেশ, কেউ পশ্চিমবঙ্গ কেউবা সুদূর আমেরিকা। আমাদের তেমন তাড়া নেই। ফেরত যাত্রার টিকিট সে ভাবেই কাটা আছে। নববধুকে নিয়ে সোমু চলে যাবে গোয়া, মধুচন্দ্রিমায়। ফাঁকা বাড়িতে আমার ভাই - বোন - বন্ধু মিলে দুটো দিন মুখোমুখি বসার অবকাশ পাব - সেই অনেক আগের মতো। কত স্বর্নালী সকাল, কত বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যা ফিরে আসবে স্মরণে, মননে আর বর্ননে। সবই জীবনের ধন, কিছুই যাবেনা ফেলা। একদিন মামা বলল, বাপি চল না আমরা রাজস্থান ঘুরে আসি। রাজস্থান! সে তো বিরাট ব্যাপার, অত সময় কোথায় আমাদের! মালি বলল, রাজস্থান পুরো ঘুরেত দু'তিন সপ্তাহ' সময় লাগে। তোমরা বরং পিঙ্ক সিটি জয়পুরে দুদিন কাটিয়ে অঅসাতে পার। মেয়ে বলল, বেশ তাই হোক। কিন্তু জয়পুরকে তুমি পিঙ্ক সিটি বলছ কেন পিসি? মলি বলল। গেলেই বুঝতে পারবি। চারদিকে এত গোলাপী রং যে তোর খা লি মনে হবে, কোনো গোলাপ বাগিচা নয়, পুরো একটি গোলাপী শহরের মধ্যে তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

মাশা সড়ক পথে য়েতে চায়, ওরা মার ইচ্ছে ট্রেনে। মলি বলল, চিন্তা করো না, বাস - জার্নি খারাপ হবে না।

পাণ্ডারা রোডে বিকানীর হাউস থেকে বাস ছাড়ে। টিকিট ওখান থেকে দেয়। অজয় জানাল। ধোলাকুয়াতেও টিকিট প াওয়াযাবে এবং এখান থেকেই বাসে ওটা ভাল।

ধোলাকূঁয়া বাস স্ট্যান্ডএই চানক্যপুরী থেকে বেশি দূরে নয়, বিকেলে বিভাসকে সঙ্গে নিয়ে টিকিট কিনে আনলাম। পরদিন সকালে রওনা হবে। খুকু শুনলে বলত, তোদের পায়ের তলায় সর্ষে আছে।

পরদিন সকাল নটায় আমাদের বাস। আমার আই.এস. বন্ধু, অনাচল সরকারের অর্থ কমিশানার সাহেবের ড্রাইভার সস স্মানে আমাদের স্ট্যান্ডেপৌঁছে দিয়েছে। যথাসময়ে বিকানীর হাউস থেকে ছেড়ে আমাদের নির্দিষ্ট গাড়িটিও এসে গেল। র াজস্থান টুরজিমডেভেলপমেন্ট করপোরেশানের এই ডিলাক্স গাড়িগুলির বাইরে একটি বর্ডার লাইনের রং দেখে তার শ্রে ণিচরিত্র বোঝা যায়। যেমন পিঙ্ক লাইন হলে বেশি দামি, সিলভার মাঝারি আর ব্লু কমদামি। আমরা সিলভার লাইনের টিকিট কিনেছি। ভাড়া মাথাপিছু ২২০ টাকা।পিঙ্ক হলে লাগত ৩২০ আর ব্লু হলে ১১৮ টাকা। এখানে জানিয়ে রাখি দিল্লী থেকে জয়পুরের দূরত্ব সড়কপথে ৩০৬ কিলোমিটার (কোটপুলি হয়ে গেলে ২৫৯ কি.মি.)।

গাড়িতে উঠে বসতেই আমরা সবাই একটা করে সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্র ও এক বোতল মিনারেল ওয়াটার পেয়ে গেলাম। মলি ঠিকই বলেছিল, এ বাসযাত্রাটি বেশ আরামদায়ক। যেমন সুন্দর মসৃন জয়পুর রোড, তেমনি সুখকর আর টি.ডি.সি-র এই ডিলাক্স কোচ। গুরগাঁও (হরিয়ানা) হয়ে ঘন্টা তিনেক ছুটে গাড়ি থামল আলোয়ারে আর টি.ডি.সি. রেস্তোঁরার সামনে। এখানে কিছুক্ষনের বিরাম। হাতমুখ ধুয়ে, টয়লেট ইত্যাদি সেরে, সামনে খাওয়া দাওয়া করে আবার ছুট। ক্রমশ প্রকৃতির রূপ বদলাতে লাগল, রাজস্থানেরপথে ও প্রান্তরে দেখা দিল উটের সারি, উট চালিত শকট। বেলা অ াড়াইটে নাগাদ আমরা পৌঁছলাম জয়পুর কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ডে (সিদ্ধি ক্যাম্প)। থাকার জায়গা ঠিক করা নেই। আর টি. ডি.র বুকলেট কিংবা 'জয়পুর ভিসান' নামক ট্যুরিস্ট ম্যাগাজিন গাইডে অসংখ্য লজ, হোটেল ইত্যাদির নাম ঠিকানা দেওয়া আছে। প্রাত্যহিক ভাড়ারও উল্লেখ আছে। আমরা ধারেকাছে সংসার চন্দ্র রোড়ে একটি হোটেলে উঠলাম, নাম শিকার'। এখানে কোচবিহারের দুই বাঙালি কর্মচারীকে পেয়ে ভালো লাগল, অন্তত মাতৃভাষায় দুটো কথা তো বলতে প ারা যাবে! সংসারচন্দ্র নামটিও বেশ বাঙালি - বাঙালি। পরে জেনেছি, এককালে জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বাঙালি সংসারচন্দ্র সেন। তাঁর নামে এ রাস্তা। এ রাস্তার উপর ওয়েলকাম গ্রুপের পাঁচতারা 'মানসিংহ' হল বেশ কিছু হোটেল

রয়েছে।

মুখহাত ধুয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের চা - পর্ব হোটেলেই নিষ্পন্ন করলাম। আমরা বেড়াতে বেরোব পরদিন সকালেকিন্তু আজকের সময়টুকুই বা নষ্ট করি কেন? বাইরে তখনও দিনের আলো খুব ম্লান হয়নি।। অন্তত শহরটাতে পাখির চোখ নিয়ে একবার চক্কর দিয়ে আসলে মন্দ কী। অতএব একটি অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। বেরিয়েই বুঝলাম জয়পুরকে কেন পিঙ্ক সিটি বা গোলাপী শহর বলা হয়। এর প্রাসাদের গায়ে, বাড়ির দেওয়ালে, বানিজ্য কেন্দ্রে, সর্বত্রই কমবেশি ছাড়িয়ে আছে গোলাপী রঙের রোমান্টিকমায়া। কথিত আছে, সুদূর অতীতে কোনো এক দৈবজ্ঞের পরামর্শে এখানকার রাজা আইন করে এই গোলাপী রঙের ব্যবহার চালু করেছিলেন। আর এই রঙের মায়াতেই বাঁধা পড়েছিলেন একদা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট (১৮৮৩)। তাঁর ভারত ভ্রমনকেকেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল অ্যালবার্ট হল (১৮৮৭) যা এখন জয়পুরের কেন্দ্রিয় যাদুঘর। শহরের দক্ষিন প্রান্তে রামনিবাস উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত এ গৃহের দ্বারোদঘাটন হয় ১৮৮৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। প্রাচ্য ও ভিকটোরীয় স্থাপত্যের মিশ্রনে এই হল তৈরি করতে তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল চার লক্ষ চুরানববই হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ টাকা। এখানে জয়পুর রাজাদের খান পনেরো বড় বড় ছবি আছে সেই পৃথ্বীরাজ থেকে মানসিং পর্যন্ত।

জয়পুর একটি জেলা শহর এবং বর্তমানে রাজস্থানের রাজধানি। ইতিহাস জানায়, ১৭২৭ সাল পর্যন্ত অম্বর রাজ্যের শাসকেরাই ছিলেন জয়পুরের শাসক। সুদূর অতীতে অম্বর ছিল ধুন্দুরাজদের অধীনে, আর তখন সম্ভবত এর নামও ছিল ধুন্দর। তারপর কয়েকশো বছর শাসন করেছে অযোধ্যা থেকে আসা কুশাবহ বা কাছওয়া রাজবংশ (শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলে এদের দাবি)। এইবংশের প্রথম রাজা বজ্রদমন ছিলেন গোয়ালিয়রের শাসক। সেখানকার প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি কনৌজের অধিকার বিনষ্ট করে জয়পুর দখল করেন। পরে দৌসায় তার রাজধানী স্থাপন করেন। দুলা রায়ের উত্তরাধিকারীরা ১১৫০ সালে অম্বর দখলকরে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। মানসিংহের পিতামহ প্রথম রাজপুত রাজা বাহারমল (১৫৪৮-১৫৭৪) মুঘলদের বশ্যতা মেনে নিলে অম্বরের শাসনভার পান মহারাজা প্রথম জয়সিংহ যিনি মীর্জা রাজা বলেও পরিচিত। বাহারমলের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবানদাস কন্যা সম্প্রদান করেন সেলিমকে। ভগবানদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন মানসিংহ। দিল্লীর দরবারে তাঁর আসন ছিল সম্রাট আকবরের পরেই। দ্বিতীয়জয়সিংহের আমলে (১৬৯৯ - ১৭৪৩) রাজধানী অম্বর থেকে স্থানান্তরিত হয় জয়পুরে (১৭২৭)। তিনি বুঝেছিলেন, পাহাড়ের উপরেঅবস্থিত অম্বরের চেয়ে তিনদিক পাহাড়বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র জয়পুর রাজধানী হিসেবে অনেক বেশি নিরাপদ হবে। এই জয়সিংহ ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাস্তুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল অনায়াস বিচরণ। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভা লক্ষ করে সম্রাট ঔরংজেব তাঁকে 'সোয়াই' অভিধায় অভিহিত করেছিলেন। 'সোয়াই' অর্থাৎ সোয়া, মানে পূর্ণ এক যোগএক - চতুর্থাংশ (১ ১/৪)। ঔরংজেব বোঝাতে চেয়েছিলেন অন্যান্য রাজারা যদি পূর্ণ এক হন, তবে জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ হলেন সোয়া এক। সেই থেকে এই সোয়াই কথাটা রাজপরিবারের বংশধারায় উপাধির মতো যুক্ত হয়ে যায়। অম্বরের এগারো কিলোমিটার দূরে জয়পুর শহরকে নবগ্রহের কল্পনানুযায়ী নয়টি আয়তাকার ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা করেন জয়াসিংহ। তাঁর পরিকল্পনাকেবাস্তবায়িত করার নক্শা নির্মান করেন তাঁরই তণ বাঙালি মন্ত্রী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। মাইকেল টডের (২০ - ০৩ - ১৭৮২ থেকে ১৭ - ০১ - ১৮৩৫) 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থে এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতের বাস্তু - নির্মান রীতিতে গড়ে ওঠে জয়পুর শহর। নকশা নির্মাতা জ্যোতিশাস্ত্রেরও সুপন্ডিত ছিলেন। মহারাজ জয়সিংহকে তিনি যেমন জ্যোতিষবিদ্যা দাস করেছেন, দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে পঞ্জিকাসংস্কারও করেছেন।

সোয়াই জয়সিংহের আর এক অনন্য কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। জয়পুর বারানসী, মথুরা, উজ্জয়িনী ও দিল্লীতে। এদের মধ্যে জয়পুরের মানমন্দিরই বৃহত্তম। এখানে প্রচুর যন্ত্র। রাশিবলয় যন্ত্র, ক্রান্তিবৃত্ত যন্ত্র, রামযন্ত্র, সম্রাট যন্ত্র, যন্ত্ররাজ, জয়প্রকাশ যন্ত্র, আরো কত কী। কোনোটা আকাশচুম্বী লম্বা, কোনোটা কুপের মতো গভীর, কোনোটা আয়তাকার। যন্ত্রগুলি মুলত ইট, পাথর ও ধাতুনির্মিত। সূর্য ঘড়ি বা সান ডায়ালে ছায়া দেখে দিনের সময় নিপন করা যায়। চন্দ্র ও সুর্যগ্রহনের হিসাব দিগবলয় থেকে সুর্যের উচচতা, গ্রহ তারা সম্পর্কে নানা তথ্য যন্তর মন্তর থেকে পাওয়া যায়। জয়সিংহ নিজে নক্শা বানিয়ে এসব যন্ত্র নির্মান করিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এদের, নির্ভুলতা পরীক্ষার জন্য জ্যোতিষে

উন্নত পর্তুগালে পন্ডিতদের পাঠিয়েছেন জ্ঞানার্জনের জন্য। তাঁদের সঙ্গে জয়পুর এসেছিলেনবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সোভিয়ার ডি. সিলভা। আশ্চর্যের কথা, জয়সিংহ ওদের যন্ত্রপাতির ভুল বের করেছিলেন। তুর্কীস্তানের জ্যোতিবিদ তুলুক বেগের অনেক যন্ত্রের ত্রুটিও তাঁর নজর এড়ায়নি।

বস্তুত, প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা, গনিত, ভেষজ এবং রসায়নের যে চর্চা ও অনুশীলন গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী কালে তা ঐতিহ্যে পরিনত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহিরের মতো অসামান্য পণ্ডিতদের নানা আবিষ্কারের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক সাফল্যের পূর্বাভাষ নিহিত। গনিতে শূন্য (০) সংখ্যার উদ্ভাবন, পৃথিবীর ঘুর্নন প্রক্রিয়ায় অক্ষদণ্ডের তত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যার নানান বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত ভারতীয় পণ্ডিতদের উচচস্তরের জ্ঞানানুশীলনের সাক্ষ্য বহন করে। ব্রহ্মগুপ্ত নিউটনের অনেক আগেই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন যে বস্তুসমূহ পৃথিবীর অভিকর্ষের টানেই মাটিতে নেমে আসতে পারে। আমাদের সোয়াই জয়সিংহ কিংবা বিদ্যাধর ভট্টাচার্য ভারতীয় পন্ডিতদেরই সার্থক উত্তরাধিকারী।

যাহোক আধুনিক ইতিহাস জানাচ্ছে, ১৮১৮ সালে জয়পুর ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিনত হয়। স্বাধীনতার পরে নেহের রাজ্য পুনর্গঠন কর্মসূচিতে সে রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরদিন আমরা জয়পুর ভ্রমণে বেরোলাম। যাঁরা প্যাকেজ বা কন্ডাক্টেড ভ্রমনের তড়িঘড়ি পছন্দ করেন না (যেমন আমি), তাঁদের জন্য আছে ট্যাক্সি, অটো, এবং রিক্শা। সময় ও পরিস্থিতি অনুকুল থাকলে পায়ে হেঁটে বেড়ানো সবচেয়ে ভালো। এ ব্যাপারে উৎসাহীরা 'জয়পুর ভিসান'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ওরা হাঁটাপথের ছক এবং নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন। আমরা একটি অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রাচীন শহর জয়পুরে দেখার আছে অনেক কিছু। প্রথমেই দেখব জয়পুর রাজাদের প্রাসাদ চন্দ্রমহল বা সিটি প্যালেস। সুবোধ চত্রবর্তী লিখেছেন, 'প্যালেস তো নয়, যেন একটা ছোটখাটো শহর'। এখানে ঢোকার প্রধান দুটি ফটক - একটি দক্ষিণ দিক থেকে অতীশ দরওয়াজা, অন্যটি পূর্বদিক থেকে সিরোহী দেউড়ি। বেরিয়ে আমাদের অটো গলিপথ (লেন) দিয়ে খানিকটা উত্তর মুখো গিয়ে একটা বড় চওড়া রাস্তায় উঠে ডানদিকে অর্থাৎ পূর্বমুখে চলল। এই চওড়া রাস্তার দুপাশে যত বাড়ি, দোকান পাট, সবেতেই কমবেশি গোলাপী রঙের প্রলেপ। চাঁদপোল বাজার। কিছুটা যেতেই একটা চৌরাস্তা - ছোটি চৌপর। আমরা বলি চৌরাস্তা, ওঁরা বলে চৌপর, আবার ত্রিপুরায় দেখেছি চৌমুহনি, ব্যাপারটা আসলে এক।

এই চৌরাস্তার বাঁদিকে অর্থাৎ উত্তরে গঙ্গোরী বাজার ডানদিকে (দক্ষিন) কিষাণপোল বাজার। আমরা যাচ্ছি সোজা একটু এগোতেই ত্রিপোলিয়া বাজার - বাঁদিকে প্যালেস কমপ্লেক্সে ঢোকার তোরনদ্বার - অতীশ গেট। অনেকে বলেন ত্রিপোলিয়া গেট। আমরা এখানে নামলাম। অটো ওয়ালা পূর্বদিকের গেটে অপেক্ষা করবে। অতীশ গেট দিয়ে ঢুকলে বাঁদিকে দেখা যাবে অতীশ বাজার আর ডানদিকে চাঁদনী চক। চাঁদনী চকের পেছনেই রয়েছে 'যন্তর মন্তর' যার কথা আগেই বলেছি চাঁদনী চককে ডানদিকে রেখে সামনেই পাচ্ছি প্যালেস মিউজিয়াম আর তার পেছনে মুবারকমহল (অভ্যর্থনা গৃহ)। জয়পুরের বিখ্যাত মার্বেল পাথরে অলংকৃত এ মহল নির্মান করানসোয়াই মাধোসিংহ। একসময় এখানে ছিলেন মহক্মা খাস বা রাজ - সচিবালয়। এখন তোষাখানার রাজকীয় পোশাক পরিচ্ছদের সংগ্রহালয়। এখান থেকে বিধিসিদ্ধ পোল দিয়ে এগোলো ডানদিকে সর্বতোভদ্র (দিওয়ানী খাস) বাঁদিকে পড়ে প্রতীম নিবাস চক আর সামনে আটতলা প্রসাদ চন্দ্র মহল। পোল মানে বোধহয় দরজা। তা যদি হয় তবে এমন অসংখ্য দরজা সিটি প্যালেসের অন্যতম বিস্ময়। প্রতীম নিবাস থেকে চন্দ্রমহলে যেতে চোখে পড়বে অতীতকালের দুটি রাজকীয় শিবিকা যা পুরনারীদের জন্য ব্যবহৃত হত। চন্দ্র মহলের রং ধবধবে সাদা ভেতরটা দান সুসজ্জিত। দেওয়ালে, সিলিঙে প্রচুর আয়নার কাজ। অস্ত্রাগারে ভারতের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সংগ্রহ। মানসিংহের সাড়েপাঁচ সের ওজনের তরবারি ছাড়াও জাহাঙ্গির ও শাজাহানের তরবারি, মাধোসিংহের সাত বাই চার ফুট জামা, আধমন ওজনের লৌহবর্ম ইত্যাদি নানান কৌতুহলোদ্দীপক বস্তু রয়েছে এখানে। দরবার হলে দেখা যাবে আবুল ফজল - কৃত মহাভারতের পারসি অনুবাদ এবং ভুর্জপত্রে লেখা একটি বাংলা মহাভারত। চন্দ্রমহলের পশ্চবর্তী খোলা মাঠটুকু পার হলেই গোবিন্দ দেবের মন্দির। মহারাজ জয়সিংহ বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এনে এই মন্দিরে এমনভাবে স্থাপন করে যাতে প্রাসাদ থেকে তিনি সরাসরি ভগবানকে দেখতে পান। মন্দির দেখে আবার মাঠ পেরিয়ে আর্ট গ্যালারি, সুখনিবাস থেকে নিজ্মত কী দেউড়ী, জালের চক, নক্কার কী দরওয়াজা পার হয়ে আমরা সিরে দেউড়ি গেটে

চলে এলাম। পাশেই বিধানসভা ভবন। এই গেট থেকে অটোওয়ালা আবার আমাদের. তুলে নিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে বা ড়ি চৌপরের কাছে নামিয়ে দিল। এখানেই সেই বিখ্যাত হাওয়া মহল, সাহেবরা যাকে বলেন প্যালেস অফ উইন্ডস্ । গে লাপী - রঙে ছ'তলা বাড়ি, প্রত্যেক তলায় অসংখ্য জানলা। বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত প্রতিটি জানলায় মনোহর জালির ক াজ। মুক্ত বায়ু সেবনের সাথে সাথে রাজমহিষী এবং পুরনারীগণ রাস্তার লোকচলাচল ও শোভাযাত্রা দেখতেন ওই জালির ফাঁক দিয়ে, ১৭৯৯ সালে সোয়াই প্রতাপ সিংহ করিয়েছিলেন এই অদ্ভুত মহল। রাস্তার দোকানদারেরা বাড়িটির নিম্নাংশ আড়াল করে রেখেছে। রাস্তা থেকে সাধারণ ক্যামেরায় এর ছবি তোলা সম্ভব নয়। আমরাও পারিনি। তবে ভেতরের কিছু ছবি তুলে নিলাম। ভেতরে চমৎকার সংগ্রহশালা। অস্ত্রশস্ত্র হস্তশিল্প, মূল্যবান পেন্টিং, মুদ্রা, স্থাপত্যের, নানান নিদর্শন রক্ষিত। বিশাল ক্যানভাসে রামায়ন কিংবা মুঘল দরবারের দৃশ্য, মৃগয়ার ছবি, মিনা করা বড় বড় তামার থালা দর্শককে চমৎকৃত করে।

বাড়ি চৌপরের দক্ষিনে জহরি বাজার আর উত্তরে সিরে দেউড়ি বা হাওয়ামহল বাজার। নতুন জায়গায় বাজার দেখাটাও ভ্রমন কর্মসূচির মধ্যে রাখা উচিত। জয়পুর জেলাটি কৃষিতে সম্পদশালী না হলেও তামা, অভ্র, মারবেলপাথর, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, এখানকার বয়নশিল্প, হস্তশিল্প, পেতল এনামেল ও গালা শিল্পের নানান কাজ, চন্দন কাঠ, হা তির দাঁত ও পাথরের বিচিত্র সম্ভার, কার্পেট, রেশম ও রেশমী পটের নয়য়াভিরাম বৈচিত্র্য দেখতে হলে বাজারে যেতেই হবে। আমরা মহারানী গায়ত্রী দেবীর হস্তশিল্পারও দেখলাম। কোচবিহারের রাজকন্যা গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারাজ সে ায়াই মান সিংহের তিন নম্বর মহিষী। জয়পুরে তাঁর নামে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে।

হোটেলে ফেরার পথে আবার সেই ত্রিপোশিয়া বাজার। এখানে অষ্টদশ শতকের একটি বাড়ি নবাব সাহেব কী হাভেলি' একনজর দেখে যেতেই হয়। কারন এ বাড়িতেই বাস করতেন সেই বিখ্যাত বাঙালি জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ ও স্থাপত্যশিল্পী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। পরে এখানে নবাব স্যার ফয়াজ আলি (জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী) বাস করতেন বলে বাড়িটির এরকম ন াম।

অক্টোবর মাস। আমরা জয়পুরে এসেছি পুজোর মধ্যে। এখানে বেড়ানোর পক্ষে ভালো সময়। দিল্লীতে পুজোর জৌলুস দেখে এসেছি। হবেই তো। রাজধানীতে বঙ্গসন্তানের সংখ্যা তো কম নয়। পঞ্চাশ - ষাটখানা পুজো হয় সেখানে। কোনো কোনোটা কলকাতার অনেক তাবড় পুজোকেও টেক্কা দিতে পারে। বাঙালিদের সম্পর্কে বহির্বঙ্গে একটা সাধারণ ধারনা আছে যে তারা খুব তার্কিক আরকমিউনিজম ভক্ত। প্রথমটা মানতে পারলেও শেষেরটা মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। অন্তত পুজো আচর্চা নিয়ে তাদের মাতামাতি দেখলে সেকথা মনে হয় না। তা সে দুর্গা কালী পুজোই হোক আর হরেক রকম বাব াইজম, জাতপাত, বর্নভেদ তো আছেই। জয়পুরে কিন্তু পুজোর তেমন কোনো মাতন দেখা যাচ্ছেনা। সকালে চা খেতে খেতে মাশা তার মাকে বলল, এবার কিন্তু তোমার আর অঞ্জলি দেওয়া হল না।

--- দেখি, পথে যদি সুযোগ পেয়ে যাই। ওর মা স্বগতোক্তির মতো উচচারন করল।

আমরা আজ একটা ট্যাক্সি ঠিক করেছি। অম্বর ফোর্ট দেখতে যাব। গাড়িতে উঠতে শ্রীমতী দুর্গাপুজোর কথা বলতেই র াজস্থানী ড্রাইভার পরমোৎসাহে জানতে চাইল -- আপকে যানা হ্যয় কিয়া বাঙ্গসার?

ওর 'বাঙ্গসার' শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমরা তো মাইজী, বহেনজী, ভাবীজী শুনতে অভ্যস্ত। সেখানে বাঙ্গসার কেমন যেন খট করে কানে লেগে গেল। পরে বুঝলাম রাজস্থানে বাঙ্গ কথাটা নারীর প্রতি সম্মানসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তারপর 'জী' যোগ করলে অর্থটা অন্যরকম দাঁড়াতে পারে। তাই 'জীর' বদলে 'সাব'। তো বাঙ্গচাব জানতে চাইলেন কাছে পিঠে কোনো পুজো হচ্ছে কিনা। চালক মাথা নাড়িয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। যেখানে গিয়ে থামল, তাকিয়ে দেখি, একটি পুজো প্রাঙ্গন - লেখা রয়েছে 'দুর্গাবাড়ী''। বাস , অঞ্জলি দিতে আর বাধা কী? মেয়ের ইচ্ছে না থাকলেও তার ম াতৃদেবী টেনে নিয়ে গেলেন মন্ডপে। আমি ইত্যবসরে দু' একজনের সঙ্গে আলাপ জমালাম। জানতে পারলাম, এ শহরেও দশ - বারোটা পুজো হচ্ছে। দুর্গাবাড়ির এই পুজো প্রাচীনতম, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে। আলাপ হল প্রেসিশান ড ায়মন্ডটুলস এর এরিয়া ম্যানেজার রঞ্জন বসুর সঙ্গে -- এখানে বাঙলা পঠন পাঠনের সুযোগ নেই বলে বর্তমান প্রজন্মের বাঙালি ছেলেমেয়েদের জন্য চিন্তিত। বাঙলাদেশের বাইরে, বাঙলার ইংরেজি বা হিন্দী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতেও একই সমস্যা দেখে ভালো লাগল। অঞ্জলি শেষ হলে আমরা বিদায় নিলাম। দুপুরে খিচুড়ি - ভোজের আন্তরিক আমন্ত্রন রক্ষ

াকরা গেল না।
আমরা অম্বর দেখতে যাচ্ছি। এখানে অম্বরকে বলে আমের। কবে কীভাবে ধুন্দর রাজ্য অম্বর হল, অম্বর থেকে আমের, তা বলা কঠিন। বস্তুত, জয়পুর কেন, গোটা রাজপুতনার ইতিহাসই অনেক ধোঁয়াশাবৃত। অম্বর নামটি কেউ বলেন শিবের অম্বরীশ নাম থেকে, কারো মতে অযোধ্যার রাজা অম্বরীশের নাম অনুসারে। কিন্তু এখন কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন মেলে না। তবে কুশাবহ বা কাছওয়ারাজাদের কয়েকশো বছরের শাসন সুবাদে রাজ্যটিকে কাছওয়া অম্বর ও বলা হত।
জয়পুর শহর থেকে এগারো কিলোমিটার উত্তর - পূর্বে জয়পুর - দিল্লী সড়ক সংলগ্ন এক পাহাড়ের উপর অম্বর দুর্গ ও প্রাসাদ ।দুর্গ সীমানার মধ্যে রাজপ্রসাদ ছাড়াও যা দেখার তা হচ্ছে, মাওটা লেক, মোহন বাড়ি, দিল - ই আরাম বাগ, কালী দেবী মন্দির ওজগৎ শিরোমনি মন্দির। আর বাইরে জয়গর দুর্গটি দেখে নেওয়া যেতে পারে যেখানে ছিল কাছওয়া রাজ পরিবারের কোষাগার। ১৭২০ সালে তৈরি বিশফুট লম্বা নল বিশিষ্ট পৃথিবীর সহচেয়ে বড় কামানটিও রয়েছে এখানে। এ কামান একবার ছুড়তেই নাকি এক কুইন্টাল মতো বাদ লাগত। দুর্গটি তৈরি হয়েছিল ৯৭৬ সালে, অম্বর সুরক্ষার জন্য।
আমাদের ট্যাক্সি অম্বর কোট পর্যন্ত যেতে পারবে না। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জীপ নিতে হবে। অথচ যেটুকু চড়াই তা এই অ্যামবাসাডার গাড়ি অনায়াসে যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় ব্যবস্থাপনা এমনই যে ওদের বাহন না নিলে চলবেনা।
রাজপুত স্থাপত্যের এক অনবদ্য নিদর্শন এই অম্বর রাজপ্রসাদ। অনেকে বলেন গোয়ালিয়র রাজপ্রসাদের পরেই এর স্থান। এক শতাব্দী সময় লেগেছে এর নির্মান শেষ হতে। কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজ মানসিংহ শু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। পরে জয়সিংহ শেষ করেন। প্রসাদ সংলগ্ন প্রাঙ্গন পেরিয়ে সিংহ তোরন অতিত্রম করলেই দিওয়ানি আম। এখানেই রাজারা আম জনতার বিভিন্ন দাবি - দাওয়া, অভিযোগ অনুযোগ শুনতেন। মুঘল বাদশাহদেরমতো রাজপুত রাজারাও দেখা যায় প্রশাসনিক পদ্ধতিতেদিওয়ানি আম' 'দিওয়ানি খাস' ব্যবহার করতেন। এমনকী জয়পুর বা অম্বরপ্রাসাদেও কোথাও কোথাও মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব দৃশ্যমান। সেটা অস্বাভাবিক নয়।
অম্বর প্রাসাদে শ্বেতপাথরে নির্মিত কালী দেবীর মন্দিরটি নয়নাভিরাম। বলা হয় শীলা দেবী মন্দির। শীলা কেন? যদুনাথ সর্বাধিকারী লিখেছেন যে শীলাদেরী শিলারূপে ছিলেন মথুরায় কংশরাজার রঙ্গভূমে, দেবকির সন্তানদের ওই শিলার উপর আছড়ে মারাহত যোগমায়াকে মারতে গেলে শিলাস্পর্শে দেবী অষ্টভূজা হয়ে অন্তরীক্ষে মিলিয়ে যান। পরবর্তীকালে প্রতাপাদিত্য না কী মথুরায় এসেতাই পাথরে বিগ্রহ বসিয়ে দেবীকে যশোরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যশোরেশ্বরী কালী দেবী। বারো ভুঁইয়ার আমলে মানসিংহ ছিলেন বাঙালার শাসন কর্তা। তিনি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে যশোরেশ্বরী দেবীকে অম্বরে নিয়ে আসেন (১৬০৪)। অতএব, অম্বরে যে বিগ্রহ আমরা দেখি তা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী দেবী। তবে যশোর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র কিন্তু সেকথা স্বীকার করেননি। মন্দিরের বিরাট ভারী দরজাটিতে রৌপ্যনির্মিত কপাটের উপর দশমহাবিদ্যার মূর্তি খোদাই করা আছে ঃ কালী, তারা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী,ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা, আরও দশটি রূপ আছে দেবী সরস্বতীর।
গনেশ পোল বা তোরণ পেরিয়ে অন্দর মহলে ঢুকতেই সামনে পড়বে মনোরম বাগান। ভিতরে জয়মন্দির শিশামহল, সুখনিবাস, সোহাগ মন্দির, নক্ষত্রঘর, গ্রীষ্মাবাস, হারেম, মানসিংহ মহল কত কী, জয়মন্দিরে রাজপুষদের সভা হত। শিশমহল কাচ আর আয়না - সজ্জিত মনোহর কক্ষ। সুখ নিবাসের বাতানুকূল ব্যবস্থাপনা আজও দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করে। এর দরজায় চন্দন কাঠ ও হাতিরদাঁতের সূক্ষ্ম কাকার্য দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। প্রাসাদের ভিতরে চড়াই উতরাই বিশিষ্ট রন্ধ্রপথে পুরনারীরা টানা রিকশায় যাওয়া আসাকরতেন। মানসিংহ মহলের ভিতরে পাথর আর হাতির দাঁতের কাজ দেখার মতো। মহারাজের ডাইনিং মের দেওয়ালে বিভিন্ন তীর্যক্ষেত্রের ছবি। ধর্মপ্রান রাজা এইসব প্রনাম করে খেতে বসতেন।
দুর্গ ও প্রাসাদের নীচের উপত্যকায় জগৎ শিরোমনি বিষ্ণু মন্দির। মাত্তটা লেকের পাড়ে গড়ে উঠেছে। অর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, এ দুটি বস্তু প্রাসাদ থেকে ফেরার পথে দেখাই ভালো। মুঘল ঘরানায় গড়ে তোলা দিল - ই - আরাম বাগিচাও তাই। একটু বসলে মাওটার শীতল বাতাস প্রান জুড়িয়ে দেবে।
বেরনোর মুখে সিঁড়ির উপর বসা এক রাজস্থানী বৃদ্ধাকে দেখে ছুটে গেল মাশা। বৃদ্ধের হাতে একটি বাদ্য যন্ত্র। মাশা পেছন

ফিরে বলল, - মা দেখেছ, 'সোনার কেল্লা'য় জয়সলমীরের একটি দৃশ্যে গানের সঙ্গে এই যন্ত্রটা বাজানো হয়েছিল, মনে আছে?

আমরা মনে করতে পারলাম না। মামা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল - এটার নাম কী? লোকটি রহমান্তা না কী একটা নাম বলল, ঠিক বোঝা গেলনা। মামার ইচ্ছে ছিল। কিছুক্ষণ বাজনা শোনার। কিছু আমাদের তো পায়ের নীচেয় সর্ষে। পাহাড়ের পাদদেশে অপেক্ষায় রয়েছে ট্যাক্সিসহ আমাদের ড্রাইভার।

ফেরার পথে কয়েকটা জায়গায় চোখ বোলানো যেতে পারে। যেমন - জলমহল, গেইটর, কনক বাগ, গোফিমার গার্ডেন, মহারানী কী ছাতরী, জলমহল এখন নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবেনা, গোছের। বোঝা যায় বিশাল জলাশয়ের মধ্যে কোনওদিন এক মনোরম মহল ছিল। রাজাদেরই প্রমোদ ভবন যার ভগ্ন জীর্ন দশাই এখন দৃশ্যমান। শুকনো জলাশয়ের প্রান্তদেশে বড় বড় ট্রাক মাটি ফেলছে। উন্নয়ন হবে। কনক বাগ মোটামুটি সাজানো বাগান। এখানে রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। গোলিমার গার্ডেন মূলত শপিং কমপ্লেক্স।গের্হটর হচ্ছে জয়পুর রাজাদের সমাধিভূমি। এখানে সোয়াই জয়সিংহের স্মৃতি স্তম্ভটি সাদা মার্বেল পাথরের।, এখানেই রয়েছে মাধো সিংহ, রাম সিংহ, প্রতাপ সিংহ এবং দ্বিতীয় মানসিংহের স্মৃতি স্তম্ভ। মহারানি কী ছাতরী অনুরূপভাবে রাজ পরিবারে মহিলাদের সমাধিস্থল।

আমরা শহরে ফিরে এসেছি। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেছে। অম্বরের রেস্তোরায় যা খেয়েছিলাম তা ইতিমধ্যেই হজম, মাশার খুব খিদে পেয়ে গেছে। ড্রাইভারকে বলতেই সে নিয়ে গেল এল. এম. বি. রেস্তোরায়। খাওয়া সেরে বেরিয়ে আসতেই ড্রাইভার বলল, এবার চলুন বিড়লা মন্দির, বিড়লারা সারা দেশেই স্থাপত্য ও ধর্মের নামে মন্দির ব্যবসাটাও করায়ত্ত করেছে। অন্য অনেক ব্যাপারে এগিয়ে থাকলেও এই একটি বিষয়ে টাটারা অনেক পেছনে। লক্ষী নারায়নের এই শ্বেত মন্দিরটাও তাদের অন্য অনেক মন্দিরের মতোই সুন্দর। পাহাড়ের কোলে এম. আই. রোড সংলগ্ন সবুজায়িত জায়গাটি আসন্ন সন্ধ্যারাগে বেশ মায়াময় লাগছিল। পেছনে পাহাড়েরউপর মতি ডুংরি দুর্গটি যেন তার শৈল্পিক পশ্চাদভূমি। মতি ডুংরি একটি স্কটিশ প্রাসাদের ধবংসাবশেষ। একসময় মহারাজা মানসিংহের চতুর্থ পুত্র বাস করতেন এখানে। নীচেয় নেমে বাঁদিকে ঘুরলে একটি প্রাচীন গনেশ মন্দির দেখা যায়। প্রতি বুধবার ভক্তিপ্রার্য মানুষেরা দলে দলে এখানে সমবেত হল। আর স্ট্যাচু সার্কেলের কাছে গড়ে উঠেছে। প্লানেটোরিয়াম ও বি.এম. বিড়লা সায়েন্স সেন্টার।

এবার হোটেলে ফেরার পালা। কিন্তু বাজার? বেড়াতে এসে বাজারে না ঢুকলে বেড়ানোটাই একঘেয়ে লাগবে, অন্তত মেয়েদের কাছে, আর জয়পুরে তো বাজারের ছড়াছড়ি। বাপু বাজার, নেহে, বাজার, জহরি বাজার, সিরে দেউড়ি বাজার, হাওয়ামহল বাজার, রামগঞ্জ বাজার, অতীশ বাজার, চাঁদনী চক, ত্রিপোলিয়া বাজার, চাঁদপোল বাজার, গঙ্গোরী বাজার, কিষানপোল বাজার, ঘন্টা বাজার, ওহারি বাজার, ইন্দিরা বাজার, আরো কত বাজার আছে কে জানে। আমরা প্রথমে গেলাম রাজস্থান সরকারের এম্পোরিয়াম 'রাজস্থানি তে, এখানে দরাদরির বালাই নেই। কিন্তু অন্যত্র দরাদরি না করলে লোকসান অনিবার্য। আমরা ইন্দিরা থেকে নেহে হয়ে বাপুবাজারে, টুকিটাকি সত্তদা সম্পন্ন করলাম। এদেশের নেতারা শুধু রাস্তাঘাট, স্কুল - কলেজ, মনুমেন্ট, হাসপাতাল, বিমানঘাঁটিতেই নয়, ছোট বড় বাজার গুলিতেও কেমন জাঁকিয়ে বসেছেন তা ঘুরলেই বেশ মালুম হয়ে যায়।

জয়পুরের দর্শনীয় স্থানগুলি দু'দিনেই দেখা হয়ে যায়। যাঁরা 'প্যাকেজ' এ দেখেন তাঁরা তো একদিনেই সেরে ফেলেন। আমরা মোটামুটি আড়াই দিন নিজেদের সূচি অনুযায়ী গুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দেখে নিয়েছি। আর একটা দিন থাকলে একটু দূরের কিছু জায়গাও দেখা হয়ে যেত। কিন্তু দিল্লীতে বিজয়া দশমীর দুপুরে সবাইমিলে পুজো মন্ডপ - প্রাঙ্গনে খাব কথা দিয়ে এসেছি। অতএব অদেখা থেকে গেল ঃ

১ শিশোদিয়া প্রাসাদ ও উদ্যান - জয়পুর স্টেশান থেকে ছ' কিলোমিটার উত্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বাগান ও প্রসাদ শিশোদিয়া রানীর জন্য নির্মিত হয়েছিল।

২। বিদ্যাধর গার্ডেন ঃ মধ্যযুগীয় ঘরানায় নির্মিত এ উদ্যানটি জয়পুর শহরের মূল স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের নামে গড়ে তোলা হয়। অনেকটা শিশোদিয়া উদ্যানের মতো।

৩। শাঙ্গনের ঃ শহরের ষোল কিলোমিটার দক্ষিনে ধবংসপ্রাপ্ত এই ছোট শহরে কৃষ্ণকল্যানজীর এবং অদূরে জৈন মন্দির আছে। এখানকার হাতে তৈরি কাগজ এবং ছাপা শাড়ি জগদবিখ্যাত।

৪। নাহারগড় ঃ শহর থেকে চোদ্দ কিলোমিটার উত্তর - পূর্বে সোয়াই জয়সিংহ নির্মিত একটি পুরনো দুর্গ। সোয়াই মানসিংহের হাতে এর কলেবর বৃদ্ধি হয়। এখানে আর, টি. ভি. সি.র ক্যাকেটোরিয়া 'দুর্গ' - এর সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খাবার দাবার পাওয়া যায়।
এছাড়াও আছে রামগড় (২৮ কি মি), বাগ (৩৫ কিমি) এবং সামোদ (৪০ কিমি)।
পরিশেষে জানাই, রাজস্থানে উৎসবের একটা বিশেষ আকর্ষন ও বর্নাঢ্যতা আছে। ভ্রমন - সূচির মধ্যে যদি কোনও উৎসব পড়ে যায় তবে সেটা উপভোগ করা উচিত। জয়পুরে বিশেষ উৎসবগুলি পড়ে মার্চ - এপ্রিল আর আগষ্ট মাসে। যেমন, মার্চ - এপ্রিলে হস্তী উৎসব, গঙ্গৌর, শীতলা অষ্টমী, আগস্টে জন্মাষ্টমী, রাখীবন্ধন এবং বিখ্যাত তীজ উৎসব।

।। তথ্য সহায়তা ।।

ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো), রম্যানি বীক্ষ ঃ রাজস্থান পট (সুবোধ চক্রবর্তী), ঝিকোষ (ঝিকোষ পরিষদ), ভারত ভ্রমন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), ভারতকোষ (ঐ), রাজভূমি রাজস্থান (শঙকু মহারাজ), রাজস্থান কাহিনী (কালিকারঞ্জন কানুনগো), এ প্রিন্সেস রিমেমবারস (গায়ত্রী দেবী), জয়পুর ভিসান।